উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদ : একবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে মিথ না বাস্তব ?

ড. মর্ত্তুজা খালেদ
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।

মণিপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারনাকে নতুন করে ভেবে দেখার প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে। আসলেই ক্ষুদ্র এ সকল জাতিসত্ত্বা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারনার সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় না তারা স্বকীয় সত্ত্বা বজায় রাখার বিষয়ে সচেষ্ট সে প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতসহ উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বির্বতন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের ধারনা একটি আধুনিক ইউরোপীয় ধারনা যার উদ্ভব ঘটেছিল পঞ্চদশ শতকে পবিত্র রোমান (Holy Roman Empire) সাম্রাজ্যের সর্ব ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ধর্মীয় সার্বজনীন জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে। ইউরোপীয় এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পর্কে ধারনা করার জন্য ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রজাতান্ত্রিক রোমের পতন ঘটে পঞ্চম শতাব্দীতে। আটশত বছরের প্রাচীন রোমের পতন ঘটে ভ্যান্ডাল, ভিসিগথ, অস্টোগথ, হুনসহ জার্মানসহ বিভিন্ন বর্বর উপজাতির হাতে এবং ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ভিসিগথ আক্রমণকে রোমান সাম্রাজ্যের অবসানের আনুষ্ঠানিক তারিখ হিসেবে মনে করা হয়। প্রজাতান্ত্রিক রোমের পতন ঘটার পর তার ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় রোমান চার্চ ও পোপের কর্তৃত্ব। রোমান সাম্রাজ্যের উপর পোপের আধিপত্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বর্বর নেতা শার্লামেনকে পোপ তৃতীয় লিও কর্তৃক অভিষিক্ত হবার মধ্য দিয়ে। এক জার্মান উপজাতিয় নেতাকে পোপ রোমান সম্রাট হিসেবে অভিসিক্ত করায়, এ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে কাউকে পবিত্র রোমান সম্রাট হতে হলে তাকে রোমান চার্চের অনুমোদন পেতে হবে এবং তার অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রোমান পোপ কর্তৃক অভিসিক্ত হতে হবে। এ রীতির ফলে বর্বর উপজাতির বিভিন্ন নেতা রোমান সম্রাট হবার আকাঙ্খায় একদিকে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ অব্যাহত রাখে ও অপরদিকে তারা দ্বারস্থ হয় পোপের, তার মাধ্যমে রোমান সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করার জন্য। এভাবে পোপের কর্তৃত্বাধীনে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গড়ে উঠে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বা Holy Roman Empire-এর ধারনা। চার্চের সীমা সম্প্রাসারিত হয়ে ক্রমান্বয়ে এ সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত হয় সমগ্র ইউরোপব্যাপী। ইউরোপের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয় পোপ। পোপের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতে রাজতন্ত্রের সাথেও চার্চ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে যা ইউরোপীয় ইতিহাসে ইনভেস্টিচার দ্বন্দ্ব নামে পরিচিত হয়। এ দ্বন্দ্বে রাজতন্ত্রের অবিরাম পরাজয় ঘটে। সাম্রাজ্য হারিয়ে রাজা চতুর্থ হেনরীর পোপের অনুগ্রহ লাভের জন্য ক্যানোসা দূর্গের সামনে তিন দিন নগ্নপদে দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষমা লাভ করে হারানো রাজ্য ফিরে পান।

পোপের ক্ষমতা ও তার প্রতিপত্তির চূড়ান্ত বর্হিপ্রকাশ ঘটে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের সময়(১১৬০?-১২১৬)। তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন রাজকীয় ক্ষমতা ও পোপের ক্ষমতার মধ্যকার শ্রেণীবিভাগ ও পোপের ক্ষমতাকে ঐশ্বরিক এক ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া যাজক টমান একুইনাস তার গ্রন্থ থুম্মা থিওলজিকাতে (Summa Theologica) ব্যাখ্যা করেছেন যাজকতন্ত্রের ক্ষমতা ও দাঁড় করিয়েছেন খ্রিষ্টান যাজকীয় বিশ্ববীক্ষা।

ত্রয়োশত শতকের স্থবির ইউরোপীয় সমাজে পরিবর্তন ঘটা শুরু করে ভূমিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থলে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটলে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ও ইতালীতে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ভেনিস, মিলান, ফ্লোরেন্স, নেপলস প্রভৃতির নগরের উত্থান ঘটে। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর আরব বণিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রাচ্যের পথ পাশ্চাত্যের কাছে উন্মুক্ত হয়। অচলায়ত সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়া শুরু করে। ইউরোপী অর্থনীতিতে গতিশীলতা সঞ্চয় হয়। সেই সাথে ভেঙ্গে পড়া শুরু করে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সর্ব ইউরোপীয় খ্রিষ্টিয় ঐক্য চেষ্টা। ইতালীয় নগরগুলি যা ছিল মূলত বাণিজ্য কেন্দ্র সেখানে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে সবার আগে। সেখানে সম্পন্ন হয় রেঁনেসা, যা ছিল ধর্মভিত্তিক ইউরোপীয় সমাজ ভেঙ্গে এক ধরনের পার্থিব বস্তুবাদী সমাজ গঠন। এ সময় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে দেখা দেয় পোপের কর্তৃত্ব নাশের প্রচেষ্টা যার সূত্রপাত ঘটান ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী তার ---- বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইংল্যান্ডের পথ অনুসরণ করে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে দেখা দেয় এক ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা। এ ধারনার আরও বিস্তার ঘটে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সম্পন্নের পর।

পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী চেতনা ইউরোপীয়দের সংস্কৃতির সাথে সাথে প্রাচ্যেও প্রবেশ করে। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার সংস্পর্শে এসে এশীয় দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়া হয় মিশ্র। ভারতীয়গণ উনিশ শতকে ইউরোপীয় সংস্কৃতি আত্মস্থ করার সময় তার জাতীয়তাবাদী ধারনার সাথেও পরিচিত হয়। পূর্বে দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশী ও তার সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার রীতিতে বিশ্বাসী ভারতীয় উপমহাদেশে কোন জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল না। ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তীযুগে এ উপমহাদেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্ববাদী, জাতীয়তাবাদী নয়।[১] উপমহাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার মতো কোন প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক বাধা বা প্রাচীর ছিল না ফলে উর্বর ভূমির এ উপমহাদেশে সর্বদা আকর্ষণ করেছে বিদেশীদের এবং সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ উপমহাদেশে একের পর এক বৈদেশিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বৈদেশিক আধিপত্যও এদেশবাসী মেনে নিয়েছে সহজভাবে। প্রাগৈতিহাসিক কালে আর্য আগমন থেকে শুরু করে আঠার শতকের ইংরেজ আগমন এদেশীয় অধিবাসীদের কাছে তাই কোন আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না।

মুসলমান শাসনামলে উপমহাদেশের শাসকগণ নিজেকে কখনও ভারতের রাজা হিসেবে গণ্য না করে বরং বিশ্ববাদশাহ হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁদের উপাধি ছিল জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আলমগীর, শাহ আলম ইত্যাদি এ সব উপাধির অর্থ ছিল আক্ষরিক অর্থে বিশ্বরাজা। প্রকৃত অর্থে বিশ্বরাজা না হলেও মুগল বাদশাহদের মনোভঙ্গি ছিল বিশ্বজনীন। বাদশাহকে আনুগত্য প্রদান করলে বিশ্বের যে কেউ তাঁর রাজ্যে বসবাস করতে পারতো, এমকি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও লাভ করতে পারতো। ফলে পলাশী বিজেতা লর্ড রবার্ট ক্লাইভ বাদশাহের কাছ থেকে 'সাবুদ জং' উপাধি পান অর্থাৎ বিদেশী হিসেবে পলাশী পরিবর্তনে ক্লাইভের ভূমিকাকে দিল্লীর সম্রাট কোন রকম বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করেন নি।

আঠার শতকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের সংস্পর্শে আসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করে। তৎকালীন ভারতের রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় এই জাগরণ বিকাশ লাভ করে বলে তা বেঙ্গল রেঁনেসা নামে পরিচিতি লাভ করে। আঠারো শতকে বাংলা ও তথা ভারতীয় এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে এই শ্রেণী ভারতে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে নি। কারণ ছিল উদ্ভুত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র গঠনে। বাংলা ও ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহভাজন এক শ্রেণী হিসেবে। কোম্পানী শাসনের ফলভোগ করে তারা। কোম্পানীর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে কোম্পানীর অফিস আদালতে চাকুরীর সুযোগ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে সহায়ক হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রর্বতনের ফলেও যে জমিদার

শ্রেণী সৃষ্টি হয় তারাও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত এক শ্রেণী হিসেবে বিকাশিত হয়। ব্রিটিশ অনুগ্রহ লাভকারী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহ যারা হতে পারতো জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশের অগ্রদূত তারা ছিল কোম্পানীর অনুকম্পাভুগী শ্রেণী। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী কোন চেতনা ছিল না তার প্রমাণীত হয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়। এই শ্রেণী বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে না এসে বরং ক্ষেত্র বিশেষে সহায়তা করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই শ্রেণী ভারতীয় সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। সতীদাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বর্ণবাদ প্রথার প্রভাব হ্রাস করা সহ ভারতীয় সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। এ দল গঠনের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন বিদেশী এ্যলান অক্টাভিয়ান হিউম। কংগ্রেস গঠনের প্রধান কারণ ছিল ভারতীয়দের মনোভাব জানা যেন ১৮৮৫ সালের মতো বিদ্রোহ পুনরায় সংঘটিত না হয়। রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা আদায় করা। সম্পূর্ণ উনবিংশ শতক ধরে জাতীয় কংগ্রেস তার বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ রাজের কাছে আবেদন ও নিবেদনর মাধ্যমে কার্যদ্ধার করা।

বিংশ শতকের প্রথম থেকে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার লাভ করা শুরু করে। সাম্প্রদায়িতা জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী এক মতবাদ। উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী বোধ যে প্রখর ছিল না তা স্পষ্ট হয় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। উপমহাদেশের ইসলামধর্মাবলম্বীগণ নিজেদের মুসলমান জাতি ভাবা শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্কের খিলাফাত বাতিল করা হলে এ ভারতে গড়ে উঠে খিলাফাত আন্দোলন যার উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে আবার খিলাফাতী শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করা। খিলাফাত আন্দোলন উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা যে কতটা অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট ছিল তা তুলে ধরে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভারতবর্ষে গড়ে উঠে তার লক্ষ্য ছিল অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়ন। ত্রিশের দশকে ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িতা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। ১৯৪০ এর দশকে মুসলীম লীগ ধর্মভিত্তিক এক বিকৃত জাতীয়তাবাদী ধারনার বিকাশ ঘটায়। ১৯৪০ সালের ২২ থেকে ২৪ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ২৭ তম বাৎসরিক সম্মেলনে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তার দ্বি-জাতি তত্ত্ব উত্থাপন করেন। এ তত্ত্বে হিন্দু ও মুসলমানদের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয় ও জাতিয়তা নির্ধারণের জন্য ধর্মকেই একমাত্র উপাদান হিসেবে অভিহিত করা হয়। লাহোর সম্মেলনে ইসলামধর্মাবলম্বীদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী উত্থাপন করা হয়। মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের অমূলক ধারনার সাথে অধিকাংশ মুসলমান সংহতি প্রকাশ করে। এ ঘটনা চল্লিশের দশকে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা যে কতটা অস্বচ্ছ ছিল সে কথাই স্পষ্ট করে তোলে। শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয় রাজনীতিবিদদের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ধারনা পরিস্কার না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বাইরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তৃতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল, এ দলের জাতি সংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী ধারনা পর্যালোচনা করলেই এ বিষয় অনুধাবন করা যায়।

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি মনে করতো ভারত এক জাতির দেশ এবং মুসলমানগণ এখানে সংখ্যালঘু এক ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র।[২] ১৯৪২ সালে যখন মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান দাবী উত্থাপন করে করে তাকে কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের দাবী বলে মনে করা শুরু করে ও তা সমর্থন করে নিম্নরূপভাবে তাদের মত প্রকাশ করে "The grant of self-determination to the Muslim nationalities has nothing to do with reactionary separatist theories like Pan-Islamism"[৩] অবশ্য ভারতীয় কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারনা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল

মার্কসীয় জাতীয়তাবাদী ধারনার দ্বারা যার রূপকার ছিলেন যোসেফ স্ট্যালিন। স্ট্যালিন তার প্রবন্ধ ‘Marxism and the National Question’- এ জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

> A nation is a historically constituted, stable community of people formed on the basis of a common language, territory, economic life and psychological make-up manifested in a common culture.[৪]

সুতরাং যখন মুসলীম লীগের মুসলমান জাতির স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী ভারতীয় কমিউনিস্টগণ এক জাতির স্বাধীকার আন্দোলন হিসেবে দেখে তার প্রতি সমর্থন জানায়। স্ট্যালিনের সংজ্ঞায় ধর্মীয় গোষ্ঠীকে জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয় নাই।[৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবশ্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে, পূর্বের পাকিস্তান দাবী সমর্থন করার পরিবর্তে ভারতকে তারা সতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির এক দেশ হিসেবে অভিহিত করে সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতকে এক বহুজাতির রাষ্ট্র বলে মনে করা শুরু করে। তাদের ভাষায়, “ ..... for a voluntary Indian Union of seventeen sovereign nations with their full right to self-determination -----a voluntary union of sovereign national states would only be able to maintain the unity of India”[৬] পরবর্তীতে অবশ্য ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনী পাম দত্তের প্রভাবে ১৯৪৬ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের জাতি সংক্রান্ত সংজ্ঞা পরিবর্তন করে।[৭] পাকিস্তান দাবীকে তারা অগণতান্ত্রিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী এক আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেন।

মুসলীগ লীগের জাতি সংক্রান্ত ধারনা যে অমুলক ছিল তা প্রমাণীত হয় পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর পরই তার আভ্যন্তরীণ সংকট থেকে। ১৯৫২ সাল থেকে বাংলা ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তানের পূর্বের এ প্রদেশের ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধারনা বিকাশ লাভ করা শুরু করে। কালক্রমে ধর্মের পরিবর্তে ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাঙালীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয় পাকিস্তান ভেঙ্গে উদ্ভব ঘটে বাংলাদেশ নামক নতুন এক রাষ্ট্রের।

অপরদিকে পাকিস্তানের মুসলীম জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমাংশে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এক দিকে ধর্মীয় গোষ্ঠী শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিরোধ বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে ইরানে শিয়াদের নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর পাকিস্তানে অনুরূপ বিপ্লব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সুন্নীদের উদ্যোগে গড়ে উঠে তরিখ-ই-জাফরিয়া। শিয়া-সুন্নী বিরোধ ও সংঘর্ষ পাকিস্তানের এক নৈমিত্তিক বিষয়। এ ছাড়া পাকিস্তানে রয়েছে আহমদিয়া ও কাদিয়ানী বিরোধ ও রক্ষণশীল মুসলমানগণ কর্তৃক কাদিয়ানীদের অমুসলিক ঘোষণার দাবী। উপমহাদেশ বিভক্ত হবার পর ভারত থেকে পাকিস্তানে বসতিস্থাপনকারী উর্দুভাষী মুজাহিরদের এক বিশাল আবাসস্থল গড়ে উঠে করাচী শহরকে কেন্দ্র করে। সংখ্যালঘু শিক্ষিত এই মুসলমানেরা দ্রুত সমাজে নেতৃত্বদানকারী এক গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তারা মোজাহির নামে পরিচিত হয়। এই শ্রেণীর প্রাধান্যের ফলশ্রুতিতে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে তাদের বিরোধ এক অবশ্যম্ভাবী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে শিয়া-সুন্নী, আহমেদিয়া-কাদিয়ানী, মুজাহির ও স্থানীয় অভিবাসীদের বিরোধ ও সংঘাত পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারনাকে ক্রমান্বয়ে অসার এক বিষয় বলে প্রমাণ করছে।

অপরদিকে কংগ্রেসের এক জাতির জাতীয়তাবাদী ধারনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতে, এ মত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে দেশের বিপুল এক জনগোষ্ঠী। ভারতের বিভিন্ন অংশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ধারনার সাথে একাত্ম হতে না পেরে বিভিন্ন অংশে গড়ে তুলেছে বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলন দেখা যায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম,

নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাতে। আসামে The United Liberation Front of Assam (ULFA) -এর সামরিক অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে ভারতের দক্ষিণে তালিমনাড়ু ও উত্তরপশ্চিমাংঞ্চলে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরেও রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং অধিকাংশ বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলকারীগণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে সহিংসতা।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে ভারতের দুই দুই জন প্রধান মন্ত্রীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৮৪ সালেন ৩১ অক্টোবর নিহত হন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবং তার পুত্র পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী ১৯৯১ সালের মে মাসে তামিল বিচ্ছন্নতাবাদীদের দ্বারা নিহত হন। ভারত সরকারের এক জাতির ধারনার সাথে একাত্ম হতে না পেরে এ রাষ্ট্রের দুই প্রান্তেই চলছে বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলন যা ক্রমেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারনার অসঙ্গতিই পরিস্ফূত করে তুলছে।

উপমহাদেশে এ সকল বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলন সত্ত্বেও এক প্রশ্নটি দেখা দেয় জাতীয়তাবাদী ধারনার সাথে একাত্ম না হবার এ সকল আন্দোলন সফল হচ্ছে না কেন? আবার তারা আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠতেই বা সক্ষমই হয় না কেন? এর বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সকল বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রসমূহ সহ বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির সমর্থন লাভ করছে না। সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখল করে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন বর্হিবিশ্বে তেমন আনুকূল্য লাভ করে না। দ্বিতীয়ত, ১৯৯০ এর দশকে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর পৃথিবীতে নতুন এক ধরনের বিশ্বায়নের ধারনা জনপ্রিয় হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ বিশ্বকে যেমন সীমিত করে ফেলেছে পাশাপাশি শিল্পায়ন ও বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের পন্থা জনপ্রিয় হচ্ছে। জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার ইউরোপ ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন, অভিন্ন মুদ্রা, একদেশ থেকে অপরদেশে গমন প্রক্রিয়া সহজ ও পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়া সহজতর করে পরস্পরের কাছাকাছি আসছে---- জনপ্রিয়তা পাচ্ছে একত্বের (Intregation) এর ধারনা।

বিশ্বের এই একত্বের ধারনা ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা বিকাশের প্রভাব উপমহাদেশে এসেও লাগছে। পশ্চাতপদ অঞ্চলের জনগণ বিকশিত প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের ধারনাকেই বেশী করে জনপ্রিয় করছে। ফলশ্রুতিতে সমাজের বৃহত্তর অংশের অংশগ্রহণের অভাবে উপমহাদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনসমূহ বেশীদূর এগোতে পারছে না। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসমূহকে প্রশমিত করে রেখেছে সত্য তবে তাকে হত্যা করতে পারে নাই। আর এ আন্দোলনসমূহ এ উপমহাদেশের প্রচলিত জাতীয়তাবাদের ধারনা যে অলীক ও মিথ তা প্রমাণ করছে।

---

[1] wmivRj Bmjvg (m¤úvw`Z), *evsjv‡`‡ki BwZnvm, 1704-1971*, XvKv: GwkqwUK †mvmvBwU Ae evsjv‡`k,1993, c. 3|

[2] Adhikari, G(ed.)., *Pakistan and National Unity: The Communist Solution*, (Bombay: People's Publishing House,1943),p.49.

[3] Gangadhar Adhikari, *Pakistan and National Unity: The Communist Solution* (Bombay, People's Publishing House, 1943, p. 63.

[4] http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03.htm#s7

[5] Chandra, Amitabha, " The Pakistan Question and the Communist Party of India" in Sobhanlal Datta Gupta (ed.), *India: Politics and Society Today and Tomorrow*, Calcutta: K P bagchi & Company, 1998, p. 112.

[6] Joshi PC, *The Final Bid For Power ! Freedom Programme of Indian Communists : The Communist Plan Explained* (Bombay: People's Publishing House), p. 80.

[7] Amitabha, *Op cit*, p. 122.